বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর রচনা সমগ্র

উপন্যাস

সম্পাদনা
অশোককুমার মিত্র

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

॥ সম্পাদকের কথা ॥

বিভূতিভূষণকে কেউ কেউ বলেছেন পথের কবি—আমরা বলি প্রকৃতির কবি। পথ তো প্রকৃতিরই অংশ—তার প্রান্তদেশ যে মেশে সেই শ্যামল-রুক্ষ-বর্ণময় প্রকৃতির কোলে, তার অপরূপ চিত্রময় রূপ ধরা পড়ে বিভূতিভূষণের আশ্চর্য মায়াবী কলমে। মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, বেদনা-উল্লাস, নির্মাণ ও ধ্বংসের কথায় তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকৃতির আলো-ছায়ার মরমি স্পর্শে লেগে থাকে।

বিভূতিভূষণ প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' লেখা শুরু করেছিলেন ভাগলপুর জেলার ইসলামপুর বনকাছারির বাস কক্ষে। বাইরে যখন কুয়াশার সঙ্গে জ্যোৎস্নালোকের অপূর্ব মায়া ছড়িয়েছে, অথচ তখন তাঁর মনের চোখে ফুটে উঠেছে ইছামতির তীরের সেই গ্রামখানির ছবি, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নাড়ির যোগ। সেই গ্রাম, নদী, নীলকুঠি, ধনচিতের খেয়া, মাধবপুরের উলুখড়ের মাঠ, চড়কতলার মেলা, সলতে-খাগি আমগাছ, সইমাদের বকুলগাছটা, মায়ের নিজের হাতে লাগানো সজনে গাছ, এমনকি উনুন-ঢাকা-দেওয়া মায়ের কড়াইখানা পর্যন্ত সে ছবিতে হাজির। গ্রাম-বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ, দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতি, ঋতুবদলের রঙ-বাহার আর নানা চরিত্রের জীবন্ত ছবি আঁকা হয়েছে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে। সকল গুণী পাঠক একবাক্যে স্বীকার করেছেন বাংলা সাহিত্যের ভাঁড়ারে এ এক অভিনব সংযোজন। ১৯২৯-এ গ্রন্থাকারে বেরুবার আগে 'পথের পাঁচালী' বিচিত্রা মাসিকপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পথের পাঁচালী'র কিশোরোপযোগী সংস্করণ 'আম আঁটির ভেঁপু' প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এ। সিগনেট প্রেস-এর এই বইটির জন্য চিত্রাঙ্কণের কাজ করার সময়ে মূল গ্রন্থের চলচ্চিত্র রূপ দেবার বাসনা জাগে সত্যজিৎ রায়ের মনে। সে এক অন্য প্রসঙ্গ। 'আম আঁটির ভেঁপু' অবশ্যই 'পথের পাঁচালী'র যমজ গ্রন্থ, তাই এটিকে সংকলনের প্রথমেই স্থান দিয়েছি। যেমন 'আরণ্যকে'র কিশোর রূপান্তর 'লবটুলিয়ার কাহিনি'ও আরণ্যকের রচনাকাল অনুযায়ী যথাস্থানে স্থাপন করেছি।

একথা সত্য, বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ সুপ্রতিষ্ঠা পেলেও কিশোর সাহিত্যের আঙিনায় কখনও পা রাখতেন কিনা তা বলা যায় না। বিখ্যাত ছোটোদের মাসিকপত্র মৌচাকের সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারের উৎসাহে তিনি ছোটোদের জন্য লিখতে শুরু

করেন। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ নিজেই জানিয়েছেন, 'সুধীরবাবুদের দোকানে প্রতি বিকালে এক সাহিত্যিক আড্ডা হত। কাজকর্মের অবসরে মাঝে মাঝে মৌচাক অফিসে এসে সে আড্ডাতে যোগ দিতাম'।

অনেক সাহিত্যিক, শিল্পী, মজলিশী ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে মৌচাকের আড্ডা গমগম করত। এখানেই বন্ধুবর হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণীন্দ্রলাল বসু ও ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। সুধীরবাবুর আদর-আপ্যায়ণে কত বর্ষার বৈকাল ও শীতের সন্ধ্যায় চায়ের মজলিস এখানে সরস ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে, কত ঠোঙা ঠোঙা 'অবাক জলপান' ফেরিওয়ালার ঝুড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বাদল দিনে অতিথি সৎকারে সহযোগিতা করেছে। মৌচাকের ইতিহাসের সঙ্গে সেসব ইতিহাসও জড়ানো।

একদিন সুধীরবাবু বললেন—বিভূতিবাবু, মৌচাকের জন্য লিখবেন?

আমি এক পায়ে খাড়া। বললুম, নিশ্চয়ই।

—কি লিখবেন বলুন।

—কি ধরনের লিখি আপনি-ই বলুন।

—ছেলেদের উপন্যাস দিন, কি বলেন?

এভাবে ছেলেদের জন্যে লেখা চাঁদের পাহাড়ের সূত্রপাত। সুধীরবাবুর উৎসাহ না পেলে হয়তো এ বই লেখা হত না।' শুধু এ বই কেন, ছোটোদের সাহিত্য জগতেই হয়তো তাঁর প্রবেশ ঘটত না।

'চাঁদের পাহাড়' বিভূতিভূষণের এক অসাধারণ কীর্তি। বিভূতিভূষণ, সন্দেহ নেই, ভ্রমণ-বিলাসী ছিলেন। গোরক্ষিণী সভার প্রচারের কাজে যেমন বৃহত্তর বঙ্গ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, তেমনি পেশার প্রয়োজনেও ঘুরেছেন; তাছাড়া, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জনের আমন্ত্রণে ও নিজস্ব উদ্যোগেও বহুবার বহু জায়গায় ভ্রমণের সুযোগ ঘটেছে তাঁর—অবশ্য সে সকল ভ্রমণই স্বদেশের সীমানায় সীমাবদ্ধ। চাঁদের পাহাড়-এর পটভূমি আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ অংশ যা কখনোই তাঁর চোখে দেখা নয়,—বিভিন্ন পুস্তক, পত্রপত্রিকা থেকে সংগৃহীত। 'পথের পাঁচালী'র বন-জঙ্গল, লতা-গুল্ম, হাট-মাঠ, নদী-প্রান্তর, কাশবন-শিউলিতলা সবই তাঁর অভিজ্ঞতা সঞ্জাত, কিন্তু চাঁদের পাহাড়-এ তা তো নয়। তবু বিভূতিভূষণের আশ্চর্য রচনাশৈলীতে তা বাস্তব হয়ে ওঠে। জঙ্গলে বিভিন্ন জানোয়ারের আচরণ, তৃণভূমির বিবরণ, ভূপ্রকৃতির কথা, শঙ্করের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনি যেন কল্পিত মনে হয়নি—বিভূতিভূষণ তাকে বাস্তব করে এঁকেছেন।

বাঙালি ঘর-কুনো, পরিশ্রম-ভীরু, ধরা-বাঁধা জীবনের বাইরে কোনো ধরনের ঝুঁকির কাজে পা বাড়াতে চায় না—এ ধরনের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিভূতিভূষণ ফাঁদলেন এক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি। বিপদসংকুল অভিযানে শঙ্কর বারে বারে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে, অকুতোভয় সাহসে ভর করে সে বিপদ অতিক্রম করেছে—কথায় বলে বীরের

জন্য ভাগ্যদেবীর সহায়তা মজুত থাকে—তাই সিংহ এবং গোখরো-র ডেরাতেও শঙ্কর বেঁচে রইল। শুধু বেঁচে রইল না, বাঁচিয়েও তুলল মৃত্যু পথযাত্রী এক অভিযাত্রিক পিটার আলভেরাজকে, যে একদিন হিরের খনি খুঁজে পেয়েছিল রিখটারস্‌ভেল্ড পর্বতমালায়—যাকে পর্যটকেরা বলেন চাঁদের পাহাড়। কিন্তু সে পথের কোনো মানচিত্র তার কাছে নেই, তবু ফের সে যাবেই। নাছোড়বান্দা শঙ্করকে সে সঙ্গী করে নিতে বাধ্য হল। এবং দুর্গম পথযাত্রায় একদিন আলভেরাজ প্রাণ হারাল। অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় শঙ্কর কোনোক্রমে জনজীবনে ফিরে আসে। পথে নিজের অজান্তে পেরিয়ে আসে এক গুহার মধ্যে নদীর খাতে সেই হিরের খনি যেখান থেকে পকেট বোঝাই নুড়ি তুলে পথের নিশানা নির্দেশ করতে খরচ করে ফেলে। শুধু নমুনা হিসাবে একটি নুড়ি রেখেছিল যা পরে হিরের টুকরো বলে প্রমাণিত হয়।

যে পথ ধরে সে বন-পাহাড়-নদী-গুহা পেরিয়েছিল সে পথের কোনো মানচিত্র সেও তৈরি করেনি, যেমন করেনি আলভেরাজ বা তার পুরোনো কোনো সহযাত্রী, তবু দেশে ফেরার পথেই শঙ্কর স্থির করে যে সে ফের ফিরে আসবে রিখটারস্‌ভেল্ড পর্বতমালায়—ঘরকুনো বাঙালির বদনাম সে ঘোচাবে। মৌচাক পত্রিকায় 'চাঁদের পাহাড়' (আষাঢ় ১৩৪২—চৈত্র ১৩৪৩) ধারাবাহিক প্রকাশিত হবার পর ১৩৪৪-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কিশোর পাঠকদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা জাগাবার উদ্দেশ্যে বিভূতিভূষণ মৌচাক পত্রিকায় 'মরণের ডঙ্কা বাজে' (পৌষ ১৩৪৪—আশ্বিন ১৩৪৬) এবং হীরা মানিক জ্বলে (বৈশাখ ১৩৪৮—চৈত্র ১৩৪৯) নামে দুটি উপন্যাস লেখেন। দুটি উপন্যাসের লক্ষ্য ছিল দেশের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে সুদূরের আহ্বানে সাড়া দেবার কথা জানানো।

মরণের ডঙ্কা বাজে-র কাহিনি রেঙ্গুনযাত্রী দুই বাঙালি তরুণকে নিয়ে। সুরেশ্বর যাচ্ছিল ঔষধ বিক্রির কাজে আর বিমল ডাক্তার—ওদেশে পশার জমাতে। জাহাজে ওদের আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা। রেঙ্গুনেই কত ঘটনা, না দুর্ঘটনা। শেষে চিন দেশের মুক্তি সংগ্রামে ওরা জড়িয়ে গেল। দেখল সাম্রাজ্যবাদী জাপানি বোমারু বিমানের হামলা, শান্ত জনপদে মৃত্যুর হাহাকার, ধ্বংসের নিষ্ঠুরতা। মারণলীলার মধ্যে দেখল মুক্ত দুনিয়ার মেয়ে এ্যালিস ও মিনিকে যারা শুধু সেবার কাজের জন্য দেশ ছেড়ে এসেছে এই দূর দেশে আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে। দেখেছে প্রফেসর লি-র মতো ঈশ্বর-প্রতিম মানুষের নিষ্কলুষ জীবনযাত্রা। এই তো পরম পাওয়া!

'হীরা মানিক জ্বলে'র পটভূমি তো ভারত মহাসাগরে বোর্নিওর কাছে এক অজানা দ্বীপ। বহু শতাব্দী আগে যেখানে ছিল হিন্দু মন্দিরময় এক শহর। সেই মন্দির-শহরের দেশ এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপ। তার দেখা পেয়েছিল এক নাবিক জামাতুল্লা। পরে, ঘটনাক্রমে ম্যানিলা বন্দরে মৃত্যুপথযাত্রী এক বোম্বেটের কাছ থেকে সে জানতে পারে মন্দিরময় দ্বীপের রত্ন সম্ভারের কথা, বোম্বেটের কাছে পায় মানচিত্র আর পদ্মরাগ

মণির ওপর খোদাই করা সিলমোহর। এবারে জামাতুল্লার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয় এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-নন্দন সুশীলের। সে আর তার মামাতো ভাই সনৎ চলল জামাতুল্লার আহ্বানে তার সঙ্গে সেই অজানা মন্দিরময় দ্বীপের সন্ধানে। সিঙ্গাপুরে আরও দলবল জুটিয়ে হল চূড়ান্ত যাত্রা। বিপদ তো কলকাতা থেকেই পিছু নিয়েছিল, সিঙ্গাপুরেও ছাড়েনি। এসব ছিল দুর্বৃত্তদের কর্মকাণ্ড। পরে প্রাকৃতিক তাণ্ডবলীলা। বিপুল রত্নভাণ্ডার হাতে পেয়েও হাতছাড়া হল। রত্নভাণ্ডারের রক্ষাকবচ ছিল প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতির মধ্যেই। মাঝখান থেকে প্রাণ হারাল সনৎ। যে সামান্য সম্পদ পাওয়া গেল তার অধিকাংশই অন্যদের মধ্যে বিলি করে দিল সুশীল। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে অভ্যস্ত সুশীল এই অভিযানে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তার কাছে তা অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।

বিভূতিভূষণ একটিমাত্র গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছিলেন 'মিস্‌মিদের কবচ'। এটি সরাসরি গ্রন্থাকারে (চৈত্র ১৩৪৮) প্রকাশিত হয়। দেব সাহিত্য কুটির পরিকল্পিত কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের জন্য এটি তাঁকে লিখে দিতে হয়েছিল। ফরমায়েসি লেখাটিতেও বিভূতিভূষণের স্বকীয়তার ছাপ রয়েছে। কাহিনির মূলে আছে লেখকের নিজগ্রামে সংঘটিত একটি সত্য ঘটনা। তাকে কেন্দ্র করে রহস্য রোমাঞ্চে জমজমাট এক গল্প—বাজার চলতি আর পাঁচটি গোয়েন্দা কাহিনি থেকে অবশ্যই পৃথক।

কিশোরদের জন্য রচিত চারখানি এবং দুটি মহৎ উপন্যাসের কিশোরদের জন্য লিখিত সংস্করণ নিয়ে বিভূতিভূষণের কিশোর উপন্যাস সমগ্র সংকলিত হল। একটি উল্লেখযোগ্য সমাপতন এই যে লেখক ইছামতির তীরের কাহিনি 'পথের পাঁচালী' লিখেছেন ভাগলপুরের জঙ্গলমহলে বসে, আবার নাড়া বইহার, লবটুলিয়ার অরণ্য প্রান্তরের কাহিনি যখন লিখেছেন সেই সময়ে ইছামতির তীরে তাঁর অবস্থান।

এই সংকলন প্রস্তুত করার সময়ে বিভূতিভূষণ-পুত্র তারাদাসের কথা আমার স্মৃতিপথে বারবার জেগে উঠছে। শুধুমাত্র কিশোর সাহিত্য সমগ্র নয়, বিভূতিভূষণের নির্বাচিত রচনাবলি একই প্রকাশনা থেকে আমাদের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশের কথা ছিল। তাঁর অকালপ্রয়াণে সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে কিশোর উপন্যাস সমগ্র প্রকাশ করতে পেরে এই কারণে তৃপ্তিবোধ করছি যে অধুনা দুষ্প্রাপ্য এবং বিস্মৃত 'লবটুলিয়ার কাহিনি' সংকলনভুক্ত করতে পেরেছি। বন্ধু পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই গ্রন্থের কপিটি পাওয়া গেছে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাংলার কিশোর পাঠকদের কাছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর উপন্যাস সমগ্র দু' মলাটে বন্দি করে এই প্রথম ধরে দেওয়া গেল। আমরা নিশ্চিত, এই উপহার তারা সাগ্রহে হাতে তুলে নেবে।

অশোককুমার মিত্র

আষাঢ় ১৪১৮
বিধাননগর, কলকাতা-১০৬

॥ সূচিপত্র ॥

আম আঁটির ভেঁপু	১১—৯৬
চাঁদের পাহাড়	৯৭—১৮৬
লবটুলিয়ার কাহিনি	১৮৭—৩০৪
মরণের ডঙ্কা বাজে	৩০৫—৪০০
মিস্‌মিদের কবচ	৪০১—৪৫৬
হীরা মানিক জ্বলে	৪৫৭—৫৪৪

আম আঁটির ভেঁপু

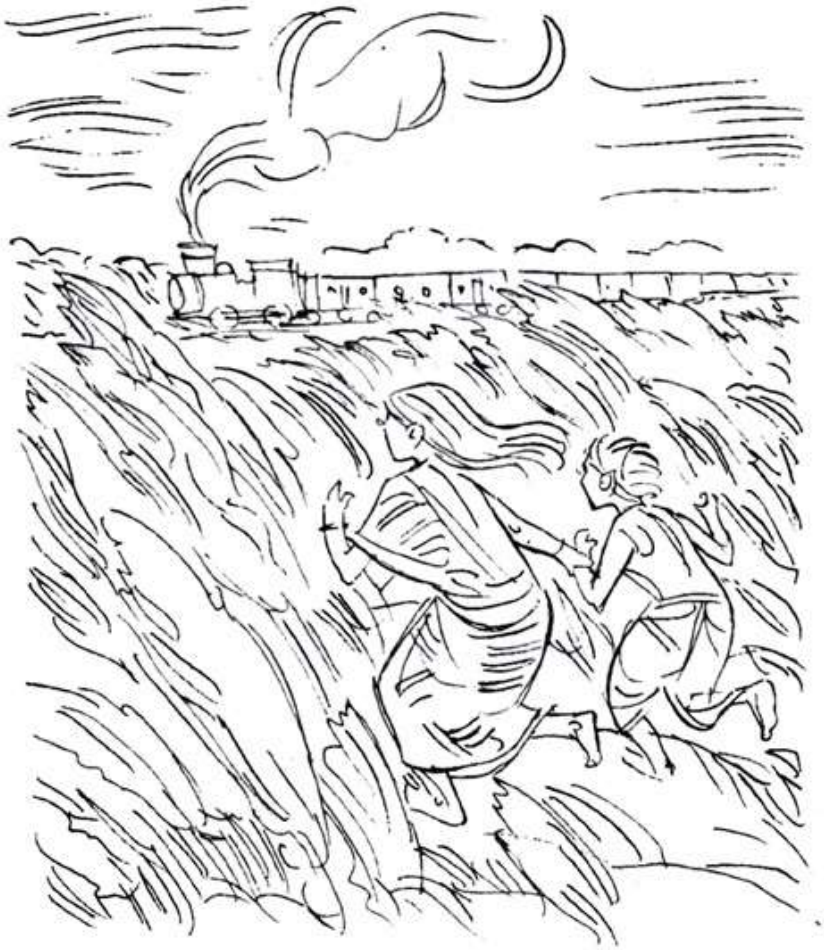

॥ এক ॥ কুঠির মাঠ

মাঘ মাসের শেষ, শীত বেশ আছে। দুই পাশে ঝোপে-ঝোপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপূজার বৈকালে গ্রামের বাহিরের মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখিতে যাইতেছিল।

দলের একজন বলিল—ওহে হরি, ভূষণো গোয়ালার দরুন কলাবাগানটা তোমরা কি ফের জমা দিয়েচো নাকি?

হরিহর সায়সূচক কিছু বলিতে গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল—ছেলেটা আবার কোথায় গেল? ও খোকা, খোকা-আ-আ—পথের বাঁকের আড়াল হইতে একটি ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে সুন্দর, ছিপছিপে চেহারার ছেলে ছুটিয়া আসিয়া দলের নাগাল ধরিল। হরিহর বলিল—আবার পিছিয়ে পড়লে এরি মধ্যে! নাও এগিয়ে চল—

ছেলেটা বলিল—বনের মধ্যে কি গেল বাবা? বড়-বড় কান? হরিহর প্রশ্নের দিকে কোনো মনোযোগ না দিয়া নবীন পালিতের সঙ্গে মৎস্য শিকারের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে পুনরায় আগ্রহের সুরে বলিল—কি দৌড়ে গেল বাবা বনের মধ্যে? বড়-বড় কান?

হরিহর বলিল—কি জানি বাবা, তোমার কথার উত্তুর দিতে আমি আর পারিনে। সেই বেরিয়ে অবধি শুরু করেচো এটা কি, ওটা কি; কি গেল বনের মধ্যে তা কি আমি দেখেচি?...নাও এগিয়ে চল দিকি—

বালক বাবার কথায় আগে-আগে চলিল।

হঠাৎ এক উলুখড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চীৎকার করিতে-করিতে ছুটিয়া গেল—ঐ যাচ্চে বাবা, দ্যাখো বাবা, ঐ গেল বাবা বড়-বড় কান, ঐ—

তাহার বাবা পিছন হইতে ডাক দিয়া বলিল—উঁহু-উঁহু—উঁ—কাঁটা-কাঁটা-কাঁটা—পরে তাড়াতাড়ি আসিয়া খপ করিয়া ছেলের হাতখানি ধরিয়া বলিল—আঃ বড্ড বিরক্ত কল্লে দেখচি তুমি, একশোবার বারণ কচ্ছি তা তুমি কিছুতেই শুনবে না, ঐ জন্যেই তো আনতে চাচ্ছিলাম না! বালক উৎসাহে ও আগ্রহে উজ্জ্বল মুখ উঁচু করিয়া বাবার মুখের

দিকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা? হরিহর বলিল—কি তা কি আমি দেখেচি? শুওর- টুওর হবে—নাও চলো, ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো—

—শুওর না বাবা, ছোট্ট যে—পরে সে নিচু হইয়া দৃষ্ট বস্তুর মাটি হইতে উচ্চতা দেখাইতে গেল।

—চল-চল—হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেচি, আর দেখাতে হবে না—চল দিকি।...

নবীন পালিত বলিল—ও হল খরগোস, খোকা, খরগোস। এখানে খড়ের ঝোপে খরগোস থাকে, তাই। বালক বর্ণ পরিচয়ের 'খ'-এ খরগোসের ছবি দেখিয়াছে, কিন্তু তাহা যে জীবন্ত অবস্থায় এরকম লাফাইয়া পালায় বা তাহা আবার সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, একথা সে কখনো ভাবে নাই।

খরগোস!—জীবন্ত! একেবারে তোমার সামনে লাফাইয়া পালায়—ছবি না, কাঁচের পুতুল না—একেবারে কানখাড়া সত্যিকারের খরগোস!! এই রকমই ভাটগাছ বৈঁচিগাছের ঝোপে! জল মাটির তৈরি নশ্বর পৃথিবীতে এ ঘটনা কি করিয়া সম্ভব হইল, বালক তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া ঠাহর করিতে পারিতেছিল না।

সকলে বনে-ঘেরা সরুপথ ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল।

মাঠের মধ্যে বেড়াইতে-বেড়াইতে নবীন পালিত মহাশয় একবার এই মাঠের উত্তর অংশের জমিতে শাঁকআলুর চাষ করিয়া কিরূপ লাভবান হইয়াছিলেন, সে গল্প করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহা হইতে বর্তমান কালের দুর্মূল্যতা, আষাঢুর বাজারে কুণ্ডুদের গোলদারি দোকান পুড়িয়া যাইবার কথা, গ্রামের দীনু গাঙ্গুলির মেয়ের বিবাহের তারিখ কবে পড়িয়াছে প্রভৃতি বিবিধ আবশ্যকীয় সংবাদের আদান-প্রদান হইতে লাগিল।

হরিহরের ছেলে বলিল—নীলকণ্ঠ পাখি কৈ বাবা?

—এই দেখো এখন, বাবলাগাছে এখুনি এসে বসবে—

বালক মুখ উঁচু করিয়া নিকটবর্তী সমুদয় বাবলগাছের মাথার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। মাঠের ইতস্তত নিচু-নিচু কুলগাছে অনেক কুল পাকিয়া আছে, বালক অবাক হইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল। কয়েকবার কুল পাড়িতে গিয়া বাবার বকুনিতে তাহাকে নিবৃত্ত হইতে লাগিল।

হরিহর বলিল—কুঠি-কুঠি বলছিলে, ঐ দ্যাখো, খোকা, সাহেবদের কুঠি—দেখচো?

নদীর ধারের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়াছিল।

বালক অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহার ছয় বৎসরের জীবনে এই প্রথম সে বাড়ি হইতে এতদূরে আসিয়াছে! এতদিন নেড়াদের বাড়ি, নিজেদের বাড়ির সামনেটা, বড় জোর রাণুদিদিদের বাড়ি, ইহাই ছিল তাহার জগতের সীমা; এতদিন কেবল তাহাদের পাড়ার ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে আসিয়া, সে

স্নানের ঘাট হইতে আবছায়া দেখিতে পাওয়া কুঠির ভাঙা জ্বাল-ঘরটার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিত, আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিত—মা, ওদিকে কি সেই কুঠি? সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠির মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ঐ মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নিচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অসম্ভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হইয়াছে।

বাড়ি ফিরিবার পথে সে পথের ধারের একটা নিচু ঝোপ হইতে একটা উজ্জ্বল রঙের ফলের থোলো ছিঁড়িতে হাত বাড়াইল। তাহার বাবা বলিল—হাঁ-হাঁ হাত দিও না, হাত দিও না—আল্‌কুশি-আল্‌কুশি। কি যে তুমি করো বাবা! বড্ড জ্বালালে দেখচি। আর কোনোদিন কোথাও নিয়ে বেরুচ্চিনে বলে দিলাম—এক্ষুনি হাত চুলকে হাতে ফোস্কা হবে—পথের মাঝখান দিয়ে এত করে বলচি হাঁটতে, তা তুমি কিছুতেই শুনবে না—

—হাত চুলকুবে কেন বাবা?

—হাত চুলকুবে, বিষ-বিষ—আল্‌কুশিতে কি হাত দেয় বাবা? শুঁয়ো ফুটে রি-রি করে জ্বলবে এক্ষুনি—তখন তুমি চীৎকার শুরু করবে।

গ্রামের মধ্যে গিয়া হরিহর ছেলেকে সঙ্গে করিয়া খিড়কির দোর দিয়া বাড়ি ঢুকিল! সর্বজায়া খিড়কির দোর খোলার শব্দে বাহিরে আসিয়া বলিল—এই এত রাত হল! তা ওকে নিয়ে গিয়েচ, না-একটা দোলাই গায়ে না-কিছু!

হরিহর বলিল—আঃ, নিয়ে গিয়ে যা বিরক্ত! এদিকে যায় ওদিকে যায়, সামলে রাখতে পারিনে—আল্‌কুশির ফল ধরে টানতে যায়। পরে ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল— কুঠির মাঠ দেখবো, কুঠির মাঠ দেখবো—কেমন হল তো কুঠির মাঠ দেখা?

॥ দুই ॥ আমের কুসি

সকাল বেলা! আটটা কি নয়টা। হরিহরের পুত্র আপন মনে রোয়াকে বসিয়া খেলা করিতেছে।

এমন সময় তাহার দিদি দুর্গা উঠানের কাঁঠালতলা হইতে ডাকিল—অপু—ও অপু—

সে এতক্ষণ বাড়ি ছিল না, কোথা হইতে এইমাত্র আসিল।

তাহার স্বর একটু সতর্কতামিশ্রিত।

দুর্গার বয়স দশ-এগারো বৎসর হইল। গড়ন পাতলা-পাতলা, রঙ অপুর মতো এতটা ফরসা নয়, একটু চাপা। হাতে কাঁচের চুড়ি, পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুল রুক্ষ—বাতাসে উড়িতেছে, মুখের গড়ন মন্দ নয়, অপুর মতো চোখগুলি বেশ ডাগর-ডাগর।

অপু রোয়াক হইতে নামিয়া কাছে গেল, বলিল—কি রে? দুর্গার হাতে একটা নারিকেলের মালা। সেটা সে নিচু করিয়া দেখাইল, কতকগুলি কচি আম কাটা। সুর নিচু করিয়া বলিল—মা ঘাট থেকে আসেনি তো?

অপু ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

দুর্গা চুপি-চুপি বলিল—একটু তেল আর একটু নুন নিয়ে আসতে পারিস? আমের কুসি জরাবো—

অপু আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিল—কোথা পেলি রে দিদি?

দুর্গা বলিল—পটলিদের বাগানে সিঁদুরকোটোর তলায় পড়েছিল। আন্ দিকি একটু নুন আর তেল!

অপু দিদির দিকে চাহিয়া বলিল—তেলের ভাঁড় ছুঁলে মা মারবে যে! আমার কাপড় যে বাসি!

—তুই যা না শিগগির করে, আসতে এখন ঢের দেরি—ক্ষার কাচতে গিয়েচে—শিগগির যা—

অপু বলিল—নারকোলের মালাটা আমায় দে। ওতে ঢেলে নিয়ে আসবো, তুই খিড়কি দোরে গিয়ে দ্যাখ মা আসচে কি না। দুর্গা নিম্নস্বরে বলিল—তেল-টেল যেন মেজেতে ঢালিসনে, সাবধানে নিবি নইলে মা টের পাবে, তুই তো একটা হাবা, ছেলে!

অপু বাড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলে দুর্গা তাহার হাত হইতে মালা লইয়া আমগুলি বেশ করিয়া মাখিল, বলিল—নে হাত পাত্।

—তুই অতগুলো খাবি দিদি?—

—অতগুলো বুঝি হল? এই তো—ভারি বেশি—যা, আচ্ছা নে আর দু'খানা—বাঃ, দেখতে বেশ হয়েছে রে—একটা লঙ্কা আনতে পারিস? আর একখানা দেবো তাহলে—

—লঙ্কা কি করে পাড়বো দিদি। মা যে তক্তার ওপর রেখে দ্যায়—আমি যে নাগাল পাইনে!

—তবে থাকগে যাক—আবার ওবেলা আনবো এখন। পটলিদের ডোবার ধারের আমগাছটায় গুটি যা ধরেচে, দুপুরের রোদে তলায় ঝরে পড়ে।

খিড়কির দোর ঝনাৎ করিয়া খুলিবার শব্দ হইল এবং একটু পরেই সর্বজয়ার গলা শোনা গেল—দুগ্‌গা ও দুগ্‌গা—

দুর্গা বলিল—মা ডাকচে, যা দেখে আয়—ওখানে খেয়ে যা—মুখে যে নুনের গুঁড়ো লেগে আছে, মুছে ফ্যাল—

মায়ের ডাক আর একবার কানে গেলেও দুর্গার এখন উত্তর দিবার সুযোগ নাই, মুখ ভর্তি। সে তাড়াতাড়ি জরানো আমের চাকলাগুলি খাইতে লাগিল। পরে এখনো অনেক

অবশিষ্ট আছে দেখিয়া কাঁঠাল গাছটার কাছে সরিয়া গিয়া গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সেগুলি গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। অপু তাহার পাশে দাঁড়াইয়া নিজের অংশ প্রাণপণে গিলিতে ছিল, কারণ চিবাইয়া খাওয়ার আর সময় নাই। খাইতে খাইতে দিদির দিকে চাহিয়া সে দোষ সম্বন্ধে সচেতনসূচক হাসি হাসিল। দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয়া জঙ্গলের মধ্যে ছুড়িয়া দিল। ভাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—মুখটা মুছে ফ্যাল না বাঁদর—নুন লেগে রয়েচে যে!

পরে দুর্গা নিরীহ মুখে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি মা?

—কোথায় বেরুনো হয়েছিল শুনি? একলা নিজে কতদিকে যাবো? অত বড় মেয়ে, সংসারের কুটোগাছটা ভেঙে দু'খানা করা নেই, কেবল পাড়ায়-পাড়ায় টো-টো করে টোকলা সেধে বেড়াচ্ছেন—সে বাঁদর কোথায় গেল?

অপু আসিয়া বলিল—মা খিদে পেয়েচে।

—রোসো, রোসো, একটুখানি দাঁড়াও বাপু, একটুখানি হাঁপ ছাড়তে দাও। তোমাদের রাতদিন খিদে, আর রাতদিনই ফাইফরমাজ! ও দুগ্‌গা, দ্যাখতো বাছুরটা ডাক পাড়ছে কেন? খানিকটা পরে সর্বজয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় বঁটি পাতিয়া শশা কাটিতে বসিল। অপু কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—আর এট্টু আটা বের করো না মা, মুখে বড্ড লাগে।

দুর্গা নিজের ভাগ হাত পাতিয়া লইয়া সঙ্কুচিত-সুরে বলিল—চাল-ভাজা আর নেই মা?

অপু খাইতে-খাইতে বলিল—উঃ চিবনো যায় না, আম খেয়ে যা দাঁত টকে—দুর্গার ভ্রুকুটিমিশ্রিত চোখ-টেপায় বাধা পাইয়া তাহার কথা অর্ধপথেই বন্ধ হইয়া গেল। তাহার মা জিজ্ঞাসা করিল—আম কোথায় পেলি? সত্য কথা প্রকাশ করিতে সাহসী না হইয়া অপু দিদির দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে চাহিল। সর্বজয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিল— তুই ফের এখন বেরিয়েছিলি বুঝি?

দুর্গা বিপন্নমুখে বলিল—ওকে জিগগেস করো না? আমি এই তো এখন কাঁটাল তলায় দাঁড়িয়ে—যখন ডাকলে তখন তো—স্বর্ণ গোয়ালিনী গাই দুহিতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। মা বলিল—যা বাছুরটা ধরগে যা, ডেকে-ডেকে সারা হল! কমলে বাছুর, ও সন্ন, এত বেলা করে এলে কি বাঁচে? একটু সকাল করে না এলে এই তেতপ্পর পজ্জন্ত বাছুর বাঁধা—দিদির পিছনে-পিছনে অপুও দুধ-দোয়া দেখিতে গেল। সে বাহির উঠানে পা দিতেই দুর্গা তার পিঠে দুম করিয়া নির্ঘাত এক কিল বসাইয়া দিয়া কহিল—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর! পরে মুখ ভ্যাঙাইয়া কহিল—আম খেয়ে দাঁত টকে গিয়েছে! আর কোনোদিন আম দেবো— ছাই দেবো! এই ওবেলাই পটলিদের কাঁকুড়তলির আম কুড়িয়ে এনে জরাবো, এত বড় গুটি হয়েছে, মিষ্টি যেন গুড়—দেবো তোমায়, খেও এখন! হাবা একটা কোথাকার—যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে!...